ঢাকা : শনিবার, ২৮ ভাদ্র ১৪১৬
SATURDAY 12 SEPTEMBER 2009

ইত্তেফাক
12 SEP 2009

চরম ব্যবস্থাপনা সংকটে বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা

ড. তোফায়েল আহমেদ

সরকারের পূর্ব পর্যন্ত (১৯৭২-...৮) পাঁচটি শিক্ষা কমিশন কাজ ...ছে। যথাক্রমে ১৯৭২, ১৯৮৮, ...০০২ এবং ২০০৩-এর পাঁচটি ...পর ২০০৯ সালে গঠিত আরও একটি ...দ্রুত একটি প্রতিবেদন শেষ করে ...র বিবেচনার জন্য পেশ করেছে। আশা ...য় এ সরকার সর্বশেষ প্রতিবেদনটির ...শসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে। ... সবগুলো কমিশনই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ...রের শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের নীতিগত কিছু ...দ্ধান্তে মোটামুটি একমত। সে ঐক্যমত্যের বিষয়গুলো হচ্ছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন, ইংরেজী তথা ভাষা ও গণিত শিক্ষার মান উন্নয়ন, বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর পাঠদানের সময়বৃদ্ধি, ঝরে পড়া হ্রাস ইত্যাদি। জাতীয় শিক্ষানীতির প্রধান বিষয়গুলোর সাথে দ্বিমত না করেও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনাগত অচলাবস্থার বিশ্লেষণই এ নিবন্ধটির মূল উপজীব্য। কারণ বিরাজিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠদানরত বিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনার সমস্যাগুলোর সমাধান না করে নীতিগত ক্ষেত্রে যত প্রগতিশীল চিন্তাই করা হোক তা মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন দুরূহ হয়ে উঠতে পারে।

আমাদের দেশের নিম্নস্তর ও মধ্যম স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা, বিদ্যালয়সমূহের গুণমান, সুযোগ-সুবিধা এক ও অভিন্ন নয়। প্রভেদ রয়েছে শিক্ষা পদ্ধতির, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষকের সক্ষমতার, শিক্ষার্থীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের। তাই অভিন্ন একটি নীতি বা ব্যবস্থা চাপানোর পূর্বে ভিন্নতা, বৈষম্য ও সক্ষমতা-অক্ষমতার ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের দিকে তাকালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার সামগ্রিক মান যে পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে, তা সত্যিকার অর্থে আশংকা ও উদ্বেগজনক।

এরকম একটি ব্যবস্থা থেকে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে উত্তরণের উপায় ও কর্মপন্থা নিয়ে বিশেষভাবে ভাবনা-চিন্তা দরকার। আমার ব্যক্তিগত ধারণা বড় বড় নীতি চিন্তার চেয়ে দক্ষ, স্বচ্ছ ও সৃজনশীল ব্যবস্থাপনা রাতারাতি না হলেও অতি দ্রুত বিরাজিত সমস্যা ও সংকটের অন্তত ৬০/৭০ শতাংশ সমাধান করতে পারে। অন্তত বিরাজিত অবস্থার ব্যবস্থাপনাগত শিথিলতা ও নৈরাজ্য একসাথে এ সংকটকে গভীর থেকে গভীরতর করছে। এখানে সিরিয়াস হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার প্রায় পুরো কাঠামোতে কলেজ শিক্ষকদের প্রাধান্য। তার সাথে যুক্ত সাধারণ প্রশাসন ক্যাডারের সবজান্তা কর্মকর্তাগণ। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে শিক্ষা আমলা ও সাধারণ আমলা এ দুয়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রণমুখিতা যত প্রবল, সহায়তার ক্ষেত্রটি ঠিক ততখানিই দুর্বল। অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ড সর্বত্রই এ ধারাটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তার উপর রয়েছে দুর্নীতি। ফলে বিদ্যালয় পর্যায়ে বিরাজিত সমস্যা ও সংকটগুলোর একটি তালিকা দিন দিন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। একটি বেসরকারি বিদ্যালয় পরিচালনা, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ছুটি, পদোন্নতি, শাস্তি ও পুরস্কার, অবসর গ্রহণ প্রতিক্ষেত্রে রয়েছে অনিয়ম ও অরাজকতা। তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে শ্রেণী কক্ষে পাঠদান ও পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির উপর।

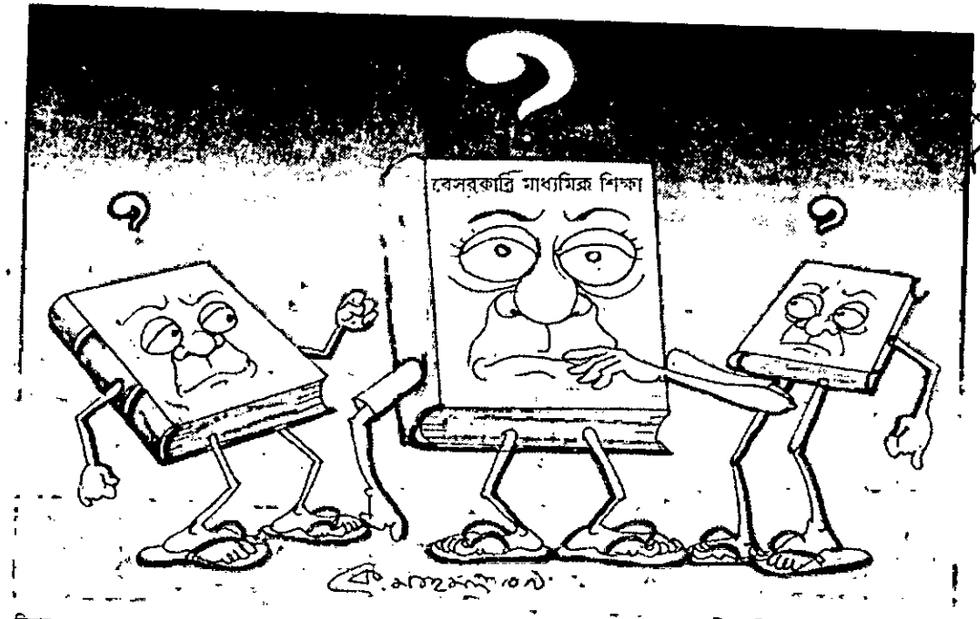

অপরদিকে শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য অনুদান (এমপিও), বিদ্যালয় উন্নয়ন সহায়তা, উন্নয়ন কাজের অর্থ বরাদ্দ ও কাজের গুণগতমান রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও রয়েছে সর্বজনবিদিত দুর্নীতি। শিক্ষা বোর্ডগুলোর সাথে বিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যেও অস্বচ্ছতার চিত্র অত্যন্ত প্রকট। সবকিছু মিলিয়ে আমাদের শিক্ষা প্রশাসন বলতে আমরা যাদেরকে বুঝি তারা অতীতে মোটেও 'বিদ্যালয় বান্ধব' হিসাবে তাদের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে পারেনি। তারা মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ওপর এক ধরনের জমিদারী করে যাচ্ছেন। আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সে জমিদারীর চিত্রটা ভিন্ন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং উপজেলা, জেলা অফিসগুলো শিক্ষক সমিতিগুলোর কাছে জিম্মি থাকে। ফলে সমিতি ও প্রশাসনের এক দুষ্ট সমঝোতায় (Unholly alliance) একটি মাফিয়াচক্রের মতই কাজ করে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ বা সুপারিনটেন্টগণ অধিদপ্তরের মাঠ কার্যালয় ও বোর্ডের এজেন্ট হিসাবে কাজ করেন। এখানে ঘুষ, অনিয়ম, দুর্নীতিসহ যতসব নৈরাজ্য তার মাধ্যম প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ। ব্যক্তিগতভাবে গ্রামাঞ্চলের কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে যতটুকু ধারণা হয়েছে তাতে মনে হয় কিছু প্রধান শিক্ষক ঘুষ, অনিয়ম ও দুর্নীতিতে এমন সিদ্ধ, অনেকক্ষেত্রে পাকা অপরাধী এখানে হার মানতে বাধ্য। সঠিকভাবে তদন্ত করা হলে অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির স্থান হবে জেলখানায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাদের এককভাবে দায়ী করা গেলেও তাদেরকে এভাবে দুর্নীতি ও অনিয়মের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার পিছনে রয়েছে বিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণকারী প্রশাসন। কিন্তু তারা হয়ত ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে। বর্তমান সময়ে গ্রামাঞ্চলে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনা কাঠামো বিভিন্নরকম নৈরাজ্যের শিকার। ব্যবস্থাপনা কমিটি কাঠামো যা রয়েছে তা হয়ত নিষ্ক্রিয় অথবা অন্যান্য হস্তক্ষেপে সিদ্ধহস্ত। দু'টি-ই চরম পন্থা। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের হাতে কমিটি ক্রীড়নক মাত্র। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের সকল প্রকার ক্ষমতা রহিত একটি কলাগাছ।

শিক্ষা প্রশাসনের স্কুলের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনাও কমিটির কর্মকাণ্ডের উপর কোন কার্যকর নজরদারী নেই। পুরো বছরে একবারও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোন পরিদর্শন হয় না। নিয়মিত অডিট বলতে কিছু নেই। সবকিছুই অর্থের বিনিময়ে ম্যানেজ করা হয়। পরিদর্শকগণের পরিদর্শন মানে একটি বক্তৃতা, ভাল আপ্যায়ন এবং আকর্ষণীয় উপহার সামগ্রী। পরিদর্শকগণ কোন প্রতিবেদন তাদের কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করেন বা দাখিলকৃত সেসব প্রতিবেদনের কোন মূল্যায়ন হয় বলে অন্তত: আমার জানা নেই। আমরা চাই সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে শতভাগ সফলতা অর্জন করুক। কিন্তু বিরাজিত সমস্যা ও সংকটগুলোর যথাযথ সমাধান না করে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। বর্তমান সময়ে প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ কিন্তু শিক্ষক সংখ্যা বাড়ছে না। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত দেখলে তা কোন কোন ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য মনে হয়। আবার বিষয় ভিত্তিক উপযুক্ত শিক্ষকের প্রসঙ্গ আনলে তা আর ও ভয়ংকর। বাংলার শিক্ষককে বিজ্ঞান পড়াতে হয়। কিম্বা ধর্মের শিক্ষক ইংরেজী পড়ান। কিম্বা একটি ক্লাসে তিনটি সেকশন থাকলেও পুরো স্কুলে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী পড়ানোর জন্য এক বা দু'জন শিক্ষক রয়েছেন। এভাবে স্কুলগুলোর সমস্যাগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হলে গ্রামাঞ্চলের ৮০% মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পক্ষে শিক্ষানীতির ভাল ভাল পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন অলীক স্বপ্ন মনে হবে।

পূর্বেই বলেছি, গত ১০ বছরে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হলেও শিক্ষক সে হারে বাড়েনি, বরঞ্চ এক স্থানেই স্থির রয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে বিষয়ভিত্তিক অনেক শূন্যপদ রয়েছে সে শূন্যপদগুলো পূরণ করা যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে সরকারের এমপিও নীতি, কোটা নীতি, ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর উদাসীনতা, অজ্ঞতা বা বিভিন্ন পক্ষপাত ও বৈরীতা দায়ী। কোন এমপিও ভুক্ত শিক্ষক অবসরে গেলে ঐ বিদ্যালয়ের এমপিওভুক্ত শিক্ষকের পদটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবার স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যতই হোক এমপিওভুক্ত শিক্ষক সংখ্যা এমপিওভুক্তির সময় যা ছিল ১০ বছর পরও তাই-ই আছে। কোন স্কুলে যদি ইংরেজী ও গণিতের শিক্ষক অবসরে যান তা'হলে ঐ স্কুলের ঐ দুই শিক্ষকের এমপিওপদ বিলুপ্ত হয়ে গেল। এ নিয়মের যাঁতাকলে পড়ে অনেক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ করতে পারছে না। অপর একটি বাঁধা মহিলা কোটা। কোটার নিয়ম রক্ষা করতে গিয়ে উপযুক্ত মহিলা প্রার্থীর অভাবে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে শিক্ষক নিয়োগ বাধাগ্রস্ত। এভাবে দীর্ঘদিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ এক রকম বন্ধ হয়ে আছে।

সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মত সুযোগ-সুবিধাতো বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকরা পান না। তারপর তাদের উপর অনেকগুলো অনিয়ম আরোপ করা থাকে। যেমন অনেক স্কুলে এমপিওর বাইরে স্কুলের নিজস্ব তহবিল থেকে শিক্ষককে কোন বেতন সহায়তা বা ভাতা দেয় না।

এমনকি অনেক বিদ্যালয় এমপিও থেকেও কিছু অর্থ কেটে নেয়। কিন্তু কাগজ কলমে বেতন বেশী দেখিয়ে সে অর্থ অন্যত্র খরচ করে। শিক্ষকদের ছুটি-ছাটা নেই। শিক্ষক স্বল্পতার জন্য অতিরিক্ত ক্লাস নিতে হয়। বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা, অবসর এসবের অবস্থা নাই বা বলা হলো। কোন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ অন্যত্র নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিলে আবেদনও করতে দেয়া হয় না। কারণ চাকরির আবেদন অগ্রায়ন করা হয় না। সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণের সুযোগগুলো গ্রহণ করা হয় না। এভাবে নিরীহ শিক্ষকগণ বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থাপনাগত অব্যবস্থার মধ্যে কাজ করতে গিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকেন। শিক্ষা প্রশাসন এসব বিষয়ের প্রতিকারের জন্য কখনও উদ্যোগী হয় না।

সরকার এখন বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকদের পুরো বেতন সহায়তা দিচ্ছেন। তাতে অবশ্যই শিক্ষাঙ্গনে একটি স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে। কিন্তু ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছ না থাকায় তার সুফল পুরোপুরি পাওয়া যাচ্ছে না। বিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় থেকে শিক্ষকদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বোনাস এবং বাড়ি ভাড়াসহ অন্যান্য বেতন সহায়তা দেয়া নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কোন শিক্ষককে তার যে কোন ন্যায্য পাওনা বা সুযোগ-সুবিধার জন্য কোথাও কোন প্রকার ঘুষ দিতে হবে না এ বিষয়টির নিশ্চয়তা দেয়া প্রয়োজন। সোজা কথা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব ব্যবস্থাপনাকে স্বচ্ছ, দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে এবং শিক্ষা প্রশাসনকে বিদ্যালয়-বান্ধব ও শিক্ষক-বান্ধব একটি মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ন্যূনতম চাকরির সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় না। বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থাপনা বা এক ব্যক্তির খেয়ালখুশীর প্রশাসনের পরিবর্তে একটি উদার অংশগ্রহণধর্মী ও সৃজনশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। দেশের প্রতিটি বিদ্যালয় তখন শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক সবার মিলিত প্রচেষ্টায় একটি নিজস্বতায় বিকাশিত হবে।

[লেখক : শিক্ষাবিদ]